ড. মুনীর উদ্দিন আহমদ ▷

আমরা নিজেরা নিজেদের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করছি

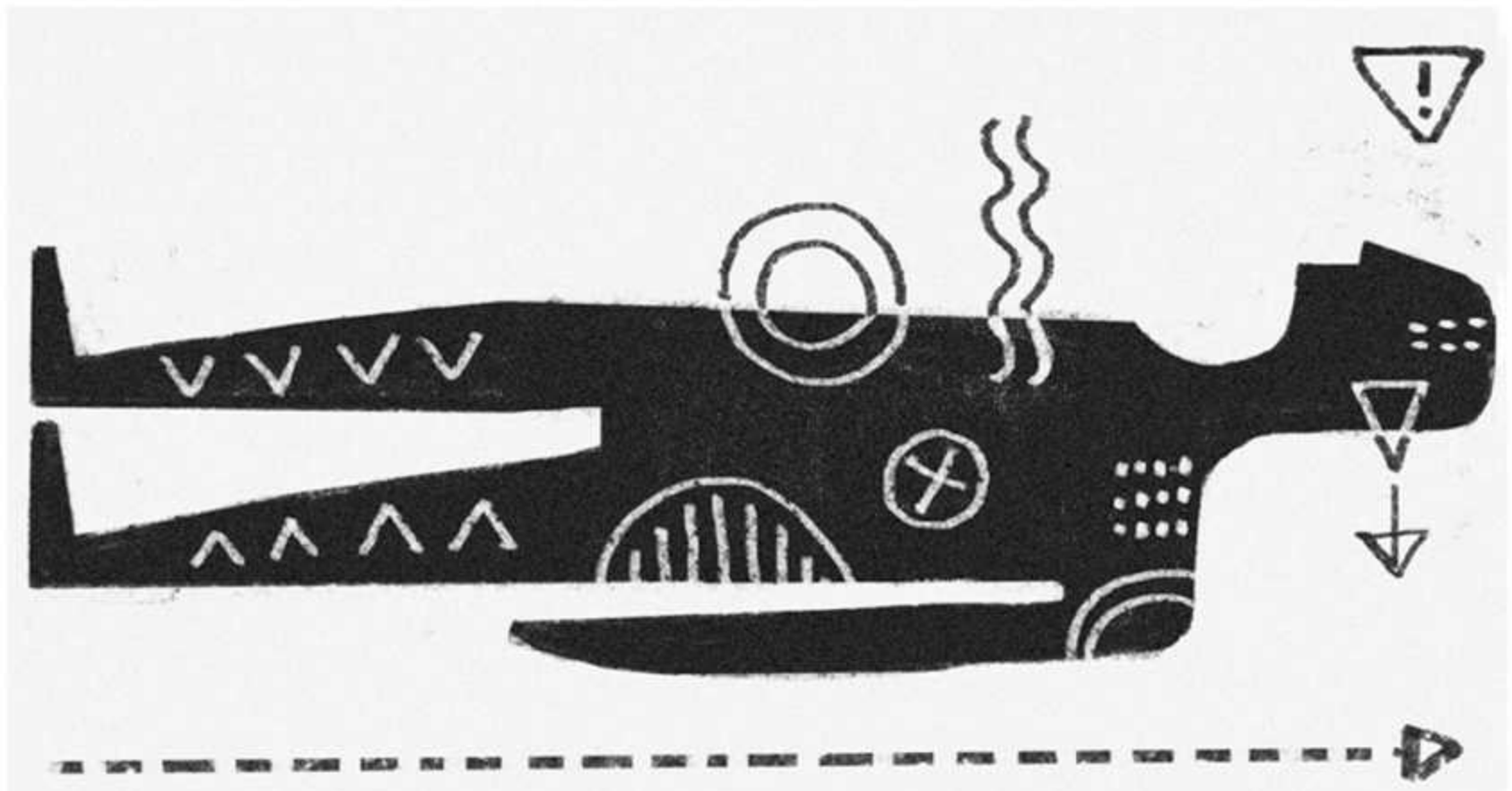

কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। কারণ কীটনাশকের প্রতি শিশুরা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। শিশুরা আকারে ছোট হলেও তারা ঘন ঘন খায়, ঘন ঘন পান করে ও বয়স্কদের চেয়ে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বেশি হয়। এ ছাড়া শিশুদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও এনজাইম সিস্টেম যথাযথ এবং পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না বলে যেকোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থকে মেটাবলিজমের মাধ্যমে বয়স্কদের মতো অতিদ্রুত নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে না

ঈদের আর বেশি দেরি নেই। ঈদে কোরবানির জন্য মোটাতাজা নাদুসনুদুস গবাদি পশুর চাহিদা বাড়বে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও গবাদি পশু ও পোলট্রি উৎপাদনে নানা ধরনের স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়। এসব স্টেরয়েডের মধ্যে রয়েছে ডেক্সামেথাসন, বিটা মেথাসন, প্রেডনিসোলন, কর্টিসন, ইস্ট্রাডায়ল, টেস্টোস্টেরন, প্রোজেস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ইত্যাদি। মাংস উৎপাদনে এসব স্টেরয়েডের ব্যবহার স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়তই কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত এসব মাংস আমরা খাচ্ছি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছি। স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি ও এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস, ইশকিমিয়া, মাইওকার্ডিয়াল ইনকার্কশন, হার্ট ফেইলিওর, স্ট্রোক, অস্টিওপোরোসিস, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড, স্তনের আকার বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস। এসব স্টেরয়েড হরমোন শরীরের প্রাকৃতিক হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অস্থিতিশীলতা ডেকে আনে, ক্যান্সার সৃষ্টি ছাড়াও লিভার ও কিডনি ধ্বংস করে। আর এ কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও বিশ্বের ভোক্তা সংগঠনগুলো ৩০ বছর ধরে মাংস উৎপাদনে স্টেরয়েড ব্যবহার না করার জন্য জোর তদবির চালিয়ে যাচ্ছে। ভোক্তা সংগঠনগুলোর মতো আমিও মনে করি, মাংস উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ওষুধ ব্যবহার করে জনস্বাস্থ্য তথা মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। বাংলাদেশে ব্যাপক হারে স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহৃত হয়ে আসছে গবাদিপশু মোটাতাজাকরণে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সরকার ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—দেশবাসী তাই আশা করে। কোরবানির জন্য কী ধরনের পশু কিনলে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে তা নিয়ে ভাবার জন্যও জনসাধারণকে অনুরোধ করছি।

২.

ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন। ভিটামিন 'এ' ঘাটতির কারণে শরীরে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। ভিটামিন 'এ' ঘাটতির কারণে শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভিটামিন ঘাটতির কারণে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন 'এ' ঘাটতি হলে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বলে তারা অতি সহজে ডায়রিয়া ও হামের মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ শিশু মারা যায়। ভিটামিন 'এ'র অভাবে শিশুদের বয়োবৃদ্ধি হয় না। ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ২০ দশমিক ৫ শতাংশ ভিটামিন 'এ' ঘাটতিতে ভোগে। বস্তির শিশুদের মধ্যে এই ঘাটতির পরিমাণ ৩৮ শতাংশ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ২ দশমিক ৭ শতাংশ গর্ভবতী, ২ দশমিক ৪ শতাংশ দুগ্ধবতী মা রাতকানা রোগে ভোগেন। মা ও শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ঘাটতি দূর করার জন্য ভোজ্য তেলে ভিটামিন সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন এবং বিএসটিআই। ইউনিসেফ এই প্রকল্পে কারিগরি সহযোগিতা দিচ্ছে আর অর্থায়ন করছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রোভড নিউট্রিশন। এই প্রকল্পের আওতায় ২২টি ভোজ্য তেল শোধনাগারের মধ্যে ১৬টি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সয়াবিন ও পাম তেলে ভিটামিন সংযোজন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। একটি জাতীয় দৈনিকে গত ২৩ আগস্ট 'ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াবে' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ভোজ্য তেলে ভিটামিন সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভোজ্য তেল সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্তরা বলছেন, দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে। এখানে ইউনিসেফের একটি বিশেষজ্ঞ দলও কাজ করছে। তাদের যুক্তি হলো, দেশে ভিটামিন 'এ'র ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন শিশু ভিটামিন 'এ'র ঘাটতিতে ভুগছে। এ ক্ষেত্রে ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সংযোজনকে সবচেয়ে ভালো উপায় হিসেবে দেখছে ইউনিসেফ। তাঁরা আরো বলেন, বিশেষজ্ঞদের মতে যাদের ভিটামিন 'এ' ঘাটতি নেই, তাদের ক্ষেত্রে এই সমৃদ্ধকৃত ভোজ্য তেল ক্ষতির কারণ হবে না। ভোজ্য তেলে যে মাত্রার ভিটামিন 'এ' সংযোজন করা হবে, তা হাইপারভিটামিনোসিস (শরীরে নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রার ভিটামিন পুঞ্জীভূত হওয়া) বা ওভার ডোজিংয়ের ঝুঁকি তৈরি করবে না। ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শতভাগ ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সংযোজন করা হলে তা স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াতে পারে। টার্গেট গ্রুপ ছাড়া সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে বাড়তি ভিটামিন 'এ' হাইপারভিটামিনোসিস তৈরি করতে পারে। এর ফলে তৈরি হতে পারে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি। জাতীয় অধ্যাপক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এম আর খান বলেছেন, দিনের পর দিন যে মাত্রাই হোক না কেন তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ভিটামিন 'এ' খাওয়ালে বড় ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এ জন্য ভিটামিন বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনীয়তা থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খেতে হবে। তিনি বলেন, ভিটামিন 'বি' ও 'সি' প্রচুর পরিমাণে খেলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ এ দুটি ভিটামিন প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ভিটামিন 'এ' পানিতে দ্রবণীয় নয় বলে সে সুযোগ থাকে না। আরো অনেক বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। কারো কারো মতে, বাজারে দুই ধরনের তেল থাকা দরকার। যাদের ভিটামিন 'এ' ঘাটতি রয়েছে তারা ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ তেল কিনবেন। আর সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ ভিটামিন 'এ' ছাড়া তৈরি তেল কিনবেন।

প্রতিবেদনটি পড়ে আমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তিতে আছি। ভোজ্য তেলে কী পরিমাণ ভিটামিন 'এ' মেশানো হচ্ছে, প্রতিবেদনে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। অথচ ভোজ্য তেলে মেশানোর জন্য ভিটামিন 'এ'র পরিমাণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কী মাত্রায় ভিটামিন 'এ' মেশালে হাইপারভিটামিনোসিস হয়, তাও কোনো বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেননি। তার পরও সব বিশেষজ্ঞ হাইপারভিটামিনোসিস ও ওভার ডোজিং নিয়ে কথা বলেছেন। হাইপারভিটামিনোসিস হলো এমন এক অবস্থা, যখন শরীরে অস্বাভাবিক উচ্চমাত্রায় ভিটামিন পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণে বিরূপ ও ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। ভিটামিন 'এ'র প্রতিদিনের সর্বোচ্চ মাত্রা হলো : এক বছরের শিশু ৬০০, চার থেকে আট বছরের শিশু ৯০০, ৯ থেকে ১৩ বছরের শিশু ১৭০০, ১৪ থেকে ১৮ বছরের মানুষ দুই হাজার ৮০০ এবং ১৯ থেকে ৭০ বছর বয়স্কদের জন্য তিন হাজার মাইক্রোগ্রাম। প্রতিদিন এই মাত্রায় ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করলে হাইপারভিটামিনোসিস 'এ' হবে না। আমি ইন্টারনেটের এক রিপোর্টে দেখেছি, বাংলাদেশে ভোজ্য তেলে ১৫ পার্ট পার মিলিয়ন (পিপিএম) ভিটামিন 'এ' মেশানো হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রতি গ্রাম তেলে ১৫ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন 'এ' মেশানো হচ্ছে। এখন প্রতিদিন কত তেল খাওয়া হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করবে শরীরে ভিটামিন 'এ'র সঞ্চিত মাত্রা। এক বছরের একটি শিশু যদি প্রতিদিন ৪০ গ্রাম তেল খায়, তবে তার দৈনিক ভিটামিন 'এ' গ্রহণের পরিমাণ হবে ৬০০ মাইক্রোগ্রাম। আর একজন বয়স্ক মানুষ যদি ২০০ গ্রাম তেল খায় দৈনিক, তবে তিনি তাঁর প্রতিদিনের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছাতে পারবেন। আমার হিসাবে যদি ভুল না থাকে, তাহলে আমি বলব, আমরা বয়স্করা কি প্রতিদিন ২০০ গ্রাম তেল খাই? যদি না খাই, তবে হাইপারভিটামিনোসিস তৈরি হবে কিভাবে?

আমি সব সময় মনে করি, প্রাকৃতিক উপায়ে ভিটামিন গ্রহণ করার কোনো উত্তম বিকল্প নেই। যে পরিমাণ ভিটামিন আমাদের দরকার তা অতিসহজে আমরা শাকসবজি, ফলমূল ও প্রাণিজ খাদ্য থেকে পেতে পারি। সহজলভ্য ও সস্তা উৎস থেকে ভিটামিন পাওয়া গেলে ভোজ্য তেলে ভিটামিন মেশাতে হবে কেন তা আমার বোধগম্য নয়। প্রাকৃতিক উৎস (যেমন—গাজর, মিষ্টি কুমড়া) থেকে যেকোনো পরিমাণে ভিটামিন গ্রহণ করলেও হাইপারভিটামিনোসিস তৈরি হবে না।

ভিটামিন 'এ' শরীরে অতিমাত্রায় জমে গেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে প্রতিবেদনে যেভাবে বলা হয়েছে, বেশি মাত্রায় ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করলে ক্যান্সার হয়—এ কথাটি ঠিক নয়।

৩.

কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, চলতি বছর জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরিতে ৬৩ প্রকারের সবজির নমুনা পরীক্ষা করে তার মধ্যে ১৭ শতাংশে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। অন্য এক পরীক্ষায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৬২টি সবজির নমুনা পরীক্ষা করে ২৩ শতাংশে মাত্রার চেয়ে বেশি কীটনাশক পায়। শাকসবজি ও ফলমূলে বেশি মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করলে তার একটি অংশ এসব খাবারের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কীটনাশকের কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু ও উঠতি বয়সী শিশুরা। এমনকি খুব অল্প পরিমাণ কীটনাশক পর্যন্ত বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের বয়োবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

কীটনাশক শরীরে প্রবেশ করলে যেসব মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, তার মধ্যে রয়েছে স্মৃতিশক্তি বিলোপ, সমন্বয়হীনতা, উদ্দীপকের প্রতি বিলম্বে সাড়া প্রদান, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ও আচরণ, স্নায়ুর দক্ষতা হ্রাস ইত্যাদি। এসব স্বাস্থ্য সমস্যার উপসর্গগুলো খুব জটিল ও সূক্ষ্ম হয় এবং অনেক সময় দৃশ্যমান হয় না বা নির্ণয় করা যায় না। এ ছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে হাঁপানি, অ্যালার্জি, অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা, ক্যান্সার, হরমোনের কার্যাবলি বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, প্রজনন ও ভ্রূণের বয়োবৃদ্ধির সমস্যা।

কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। কারণ কীটনাশকের প্রতি শিশুরা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। শিশুরা আকারে ছোট হলেও তারা ঘন ঘন খায়, ঘন ঘন পান করে ও বয়স্কদের চেয়ে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বেশি হয়। এ ছাড়া শিশুদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও এনজাইম সিস্টেম যথাযথ এবং পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না বলে যেকোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থকে মেটাবলিজমের মাধ্যমে বয়স্কদের মতো অতিদ্রুত নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে না। এ কারণে শিশুরা ক্ষতিকর কীটনাশকের সংস্পর্শে এলে অতি দ্রুত ও সহজে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। ফলমূল ও শাকসবজিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাবে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয় ক্যান্সারে। সুতরাং শাকসবজি ও ফলমূলে ব্যবহৃত কীটনাশক যাতে শিশুদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকিতে না পড়ে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

কীটনাশকের ধরন, পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে দেশের জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তাই সরকারের উচিত কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া ও স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা। রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহারের কথাও চিন্তায় রাখা দরকার। পশ্চিমা বিশ্বে অর্গানিক খাবারের (যে খাবার প্রস্তুতে কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না) কদর দিন দিন বাড়ছে। আমাদের বুঝতে হবে, প্রকৃতিতেই রয়েছে প্রকৃত সমাধান।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মাসি অনুষদ, ঢাবি
drmuniruddin@gmail.com